আবার দেশহারানোর অশনি সংকেত উপমহাদেশে?

প্রসঙ্গ আসামের নাগরিকত্ব সমস্যা

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

আসামের খবরের শংকিত হয়ে আছেন সারা উপমহাদেশের মানুষ। আরেকবার কি তবে দেশহারা শরণার্থীদের ঢেউ আছড়ে পড়বে এই উপমহাদেশের এক অংশ থেকে আরেক অংশে? সংবাদসূত্রে যা মানুষের কাছে এসেছে তা নিশ্চিতভাবেই আতঙ্কজনকই। এক কলমের খোঁচায় ৪০ লক্ষ মানুষের উপর থেকে নাগরিকত্বের পরিচয় হরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে ভারত সরকার। বাংলাদেশ কি তাদের গ্রহণ করবে? করলে বা না করলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে? এটা নিঃসন্দেহে একটা অভূতপূর্ব মানবিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত করছে। আসামে ধর্মীয় ও ভাষাগত বিদ্বেষ, সহিংসতা এবং সর্বশেষ লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশছাড়া করবার হুমকির পেছনে ইতিহাসের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা কাজ করছে। জাতিরাষ্ট্রের সংকটের এই ভয়াবহ পর্যায় অনুধাবনে ইতিহাসের মনোযোগী পাঠ দরকার। বর্তমান প্রবন্ধে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। এবিষয়ে আমরা আরও লেখা প্রকাশ করতে চাই।

সারা পৃথিবী জুড়ে দেশহীন মানুষের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। সুনির্দিষ্টভাবে যদিও এর অনুপুঙ্খ হিসেব পাওয়া কঠিন, তবু রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণার্থী বিষয়ক হিসেব অনুযায়ী এই সংখ্যা। সংখ্যার হেরফের যাইহোক, বিশ্বজোড়া দেশহীন মানুষের সংখ্যায় যদি আরো ৪০ লক্ষ যুক্ত হয় তবে এই সমস্যা তো শুধু আসাম বা উপমহাদেশের নয়, বিশ্ব রাজনীতিতেই একটা আলোড়ন তুলবে এই ঘটনা। রাষ্ট্রীয় পরিচয়হীন মানুষের মোট সংখ্যার ওপর এক কলমের খোঁচায় আরো প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের বোঝা কখনোই শুধু একটি রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার বিষয় নয়। এটা একটা ঐতিহাসিক অপরাধ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যমে ইতিমধ্যেই এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের কাছে এর আঘাত আরো বেশি। কারণ এই হতভাগ্য মানুষেরা মূলত বঙ্গভাষী। গত প্রায় একটি শতাব্দী ধরে মানচিত্রের ভাঙাগড়ায় ইতিমধ্যেই বাঙালিকে অনেক মাশুল দিতে হয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়েই দেশহীন মানুষের সিংহভাগের জীবনে এই দুর্দশা নেমে আসার প্রধান কারণ জাতিগত হিংসা, বিদ্বেষের রাজনীতি এবং মানচিত্রের ভাঙাগড়া। আসামে আজ যে সমস্ত মানুষের ওপর দেশহীনতার খাঁড়া ঝুলল তাদের উপর এই সর্বনাশ নেমে আসার কারণও একই। নিয়তির পরিহাস, একদিন যে ভূখণ্ড ছিল এক অভিন্ন রাষ্ট্রের অংশ, রাজনীতির পাশাখেলায় সেই ভূগোলের বিভাজিত দু'টি অংশের একটি অঞ্চলের মানুষের ওপর অপর অঞ্চলে নেমে আসছে দেশহীনতার অভিশাপ। আসামের আজকের নাগরিকত্ব বিষয়ক সংকটের অন্তরালেও রয়েছে জাতিগত অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও হিংসার রাজনীতি। পৃথিবীর অন্য সমস্ত প্রান্তে এ ক্ষেত্রে যা ঘটে এখানেও তার থেকে ব্যত্যয় ঘটছে না। বৈরিতার রাজনীতিতে অন্ধ ক্ষমতাধর রাষ্ট্র কোনো ক্ষেত্রেই দেশহীন মানুষের ভবিষ্যৎ অসহায়ত্ব নিয়ে ভাবিত নয়। রাষ্ট্রহীন দেশহীন ভাসমান মানুষদের এই এক অভিন্ন দুর্দশা। এটা ঠিক আসামে এক্ষুনি ৪০ লক্ষ মানুষ চূড়ান্তভাবে আইনের চোখে দেশহীন ঘোষিত হয় নি, তবু বিপদ গুরুতর। কারণ রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল অংশের মানুষদের নানা ঘোষণা ও বক্তব্য থেকে এটাও পরিষ্কার এই ৪০ লক্ষ লোকের ওপর রাষ্ট্র এক ধরনের 'অপরত্ব' চাপিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে ইতোমধ্যেই। দুর্ভাগা মানুষদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে কীভাবে আইন ও সংবিধানের নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে এই সংখ্যাকে আরো বাড়ানো যায়। এই সংখ্যার বৃদ্ধি কারো কাছে ক্ষমতায় আবার ফিরে আসার তুরুপের তাস, এক অংশের মানুষের কাছে এটা ইতিহাসের বিজয়। মানুষ বন্দী শিবিরে আত্মহত্যা করছে। উন্মাদের মত ক্ষমতার অলিন্দের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে জীবনের উজানভাটির খরস্রোতে হারিয়ে যাওয়া নগণ্য সরকারি কাগজ যা আজ জিয়নকাঠি মরণকাঠিতে পরিণত, তার সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছে। আর আরেক দল এই দুর্দশার উদযাপন করছে সাড়ম্বরে। এটাই হয়ত এই মুহূর্তে সভ্যতার সার্বিক সংকটের একটা খণ্ডচিত্র।

কী চলছে এই মুহূর্তে আসামে? ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের 'প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে' ২০১৩ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চলছে জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর 'নবীকরণ'। আবার তারই পাশাপাশি ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালে দেশের প্রচলিত নাগরিকত্ব আইনে সংশোধনীর একটি প্রস্তাব এনেছেন। এটা এমন এক সংশোধনী যার কালোছায়া গোটা উপমহাদেশের সমাজ-রাজনীতির চালচিত্রে পড়তে বাধ্য। এর অজুহাত ধরেই উপমহাদেশের অন্য অংশে জঙ্গীবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি নিজেদের তৎপরতা বৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে যাবে, এমনটাই অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এই নিয়ে চলছে রাজনৈতিক ও জাতিগত চাপান উতোর। বলা বাহুল্য, এই দুটি প্রক্রিয়ার লক্ষ্য দৃশ্যত যদিও ভিন্ন কিন্তু এর মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে আসাম রাজ্যের বঙ্গভাষী মানুষদের ভবিষ্যৎ বাঁচা-মরা। এখানে মূলত দুটি রাজনীতি ক্রিয়াশীল। একটি ভাষিক বিদ্বেষ এবং অপরটি ধর্মীয় বিদ্বেষ। ভাষিক বিদ্বেষের রাজনীতিটি রাজ্যগত। ধর্মীয় বিদ্বেষের রাজনীতিটি জাতীয় পর্যায়ের। এই দুই ধরনের বিদ্বেষের রাজনীতির মধ্যে চলছে এক ধরনের টানাপোড়েন। এক পক্ষ অপর পক্ষের উদ্যোগকে আত্মসাৎ করতে চাইছে। আসামের উগ্র ভাষিক রাজনীতির প্রতিভূরা জাতীয় পর্যায়ের হিন্দুত্ববাদের সাথে এক ধরনের বোঝাপড়া করে চাইছে তাদের শতাব্দী-প্রাচীন ভাষিক বিদ্বেষের রাজনীতির শেষ ইচ্ছাটি পূরণ করার। অন্যদিকে, হিন্দুত্ববাদীরা চাইছে আসামের উগ্র ভাষিক সংকীর্ণতার রাজনীতিকে ধর্মের খাতে ঘুরিয়ে দিয়ে নিজেদের সর্বভারতীয় লক্ষ্যসূচিকে বাস্তবায়িত করতে। জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর চূড়ান্ত খসড়া থেকে ৪০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পরাকে আসামের ভাষিক রাজনীতির পান্ডারা ব্যাখ্যা করতে চাইছেন 'বাঙালি আধিপত্য' নিয়ন্ত্রণের পথে প্রথম বিজয় হিসেবে। একই সময়ে বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের আরো নানা নেতারা এই বাদ পরাকে ব্যাখ্যা করছেন মুসলিম বিরোধী অভিযান হিসেবে। দুটি কথাই সত্য, তবে অংশত।

দেশের বাইরের মানুষের কাছে তো বটেই, ভারতের অন্য প্রান্তের মানুষের কাছেও আসামে যা চলছে তা বোঝা বেশ দুরূহ। কেন হঠাৎ করে দেশের অন্য সব রাজ্য ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র আসামেই 'জাতীয়'

নাগরিক পঞ্জীর 'নবীকরণ' প্রক্রিয়া চলছে? এখানে 'জাতীয়' ও 'নবীকরণ' কথাটিতে উদ্ধৃতিচিহ্ন রাখতে হচ্ছে। ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে আদৌ কোনো জাতীয় নাগরিক পঞ্জী কোনোকালেই প্রস্তুত হয়েছিল কিনা এই নিয়ে কেউই খুব একটা সুনিশ্চিত নন। আর হয়ে থাকলেও তার কোনো সন্ধান নেই। তাতেই বোঝা যায় জাতীয় ক্ষেত্রে ওই পঞ্জীর কতটা গুরুত্ব ছিল। আসামের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক উল্টো। এখানে নাগরিক পঞ্জী তৈরি থেকে শুরু করে আজকের 'নবীকরণ' সবটাই স্থানীয় রাজনীতির রঙে রাঙা। যদিও আসামে ১৯৫১ সালে জনগণনার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে জাতীয় নাগরিকদের পঞ্জী তৈরি হয়েছিল তা সেই নথি সেই সময়েই সরকারিভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি। কারণ এই পঞ্জী প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া ছিল ত্রুটিপূর্ণ। যারা এ কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের তথ্যসংগ্রহের বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না। তারা জানতেনই না কীভাবে এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্তারাই সে সময়েই সন্দেহ ব্যক্ত করেছিলেন ওই পঞ্জীর যথার্থতা নিয়ে। তা ছাড়া রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সেই পঞ্জীর কোনো অবিকৃত নকল সবক্ষেত্রে পাওয়া গেছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। ফলে বিষয়টি 'নবীকরণ' নয়, নতুন করেই তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়াও সত্তরের দশকে গুয়াহাটি হাইকোর্ট একটি রায়ে জানিয়েছিলেন যে, ১৯৫১ সালের জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকে সাক্ষ্য হিসেবে মান্যতা পেতে পারে না। অথচ ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে আসামের রাজনীতি তোলপাড় হয়ে আসছে ওই অসম্পূর্ণ ত্রুটিভরা আইনের চোখে মান্যতাহীন নাগরিক পঞ্জীর নিরিখে আসামে বৈধ নাগরিক ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণ করার দাবিতে। কেন ভারতের অন্যত্র এভাবে নাগরিক পঞ্জী তৈরি হচ্ছে না? কেনই বা আজ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হল যে এক কলমের খোঁচায় ৪০ লক্ষ মানুষের গায়ে অ-ভারতীয়ত্বের কলঙ্ক চাপিয়ে দেওয়াকে সোল্লাসে উদযাপন করছেন তথাকথিত সভ্য সমাজের এক বিরাট অংশের সহ-নাগরিকেরা?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আসামের ভাঙাগড়া, রাজনীতির উত্থানপতন ও সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিচিত্র পথচলার সাথে অবহিত হতে হবে। এই ইতিহাস প্রায় ২০০ বছরের। ঘটনাটা এমন নয় যে ২০০ বছরের পুরোনো কোনো অন্ধকার পর্বকে হঠাৎ করে খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে। পক্ষান্তরে, বিগত ২০০ বছর ধরে আসামের সমাজ ও রাজনীতিতে যে আগুণ ধিকিধিকি করে জ্বলছে যাকে বিভিন্ন সময়ে ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন ক্ষমতার রাজনীতির কারবারীরা, আজ তারই ভয়ঙ্কর উদ্গীরণ হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক রাজনীতির ছায়া পড়ে গত ২০০ বছর ধরে নানা ঘটনা পরম্পরায় বিচিত্র ধরনের মিথের জন্ম হয়েছে লোকসমাজের অভ্যন্তরে। সেই মিথ আজ দানবের চেহারা ধরে আত্মপ্রকাশ করেছে। আসামের রাজনীতির কেন্দ্রে রয়েছে অসমীয়া ও বাঙালিদের মধ্যে সামাজিক অবিশ্বাস, বিরোধ ও বৈরিতার এক দীর্ঘ ইতিহাস। এর অনেকটাই তৈরি করা ধারণা নির্ভর যার সাথে প্রকৃত ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই। আসামকে প্রকৃতপক্ষে বারবার নাজেহাল হতে হয়েছে নানা ধরনের তৈরি করা ধারণার শিকার হয়ে। প্রথম ধারণাটি আসাম রাজ্যের চরিত্র নিয়েই। আসামের ভাষিক রাজনীতির কারবারিরা এবং তাদের অনুবর্তী বুদ্ধিজীবীরা ভুলেই যান যে আজকের আসাম রাজ্যটি আধুনিক সময়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকবাদীদের একটি নির্মাণ। এর সাথে ব্রিটিশ উপনিবেশ-পূর্ব আহোম রাজ্যের আয়তনের বা চরিত্রের কোনো সাযুজ্য নেই। ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ প্রশাসন যখন চিফ কমিশনারের অধীন আসাম রাজ্যের জন্ম দেয় তখন তাতে এমন সব অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে যা কখনোই প্রাচীন আসামে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোনোটি ছিল পার্বত্য স্থানীয় রাজাদের সার্বভৌম রাজ্য। কোনো অঞ্চল ছিল বৃহত্তর বঙ্গদেশের অবিচ্ছেদ্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অংশ। কেউ ত্রিপুরা বা কোচ রাজ্যের অধীন। যে প্রধান দুটি অংশ নিয়ে আধুনিক আসাম তৈরি হয় তা অসমীয়াভাষী অধ্যুষিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও বঙ্গভাষী অধ্যুষিত সুরমা উপত্যকা।

'আসাম প্রপার' নামে সে সময়ে অভিহিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছিল জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বঙ্গভাষী অধ্যুষিত সুরমা উপত্যকার চেয়ে দুর্বল। ফলেই ব্রিটিশ শাসনাধীন আসাম স্বাভাবিকভাবেই ভাষিক দিক থেকে ছিল বৈচিত্রময়। সেখানে ছিল না কোনো একটি বিশেষ ভাষার একাধিপত্য। কিন্তু আধুনিক আসামকে পুরোনো আসামের অবিকৃত প্রতিরূপে ভেবে নেওয়া এবং বাস্তবে সেই ভাবাকে খুঁজে না-পাওয়া থেকেই জন্ম হয়েছে আধুনিক সময়ে আসামে জাতিগত বৈরিতার সমস্ত রাজনীতি। এই ভেবে নেওয়াকে বাস্তবে যেনতেন প্রকারে রূপায়িত করার অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক কূট রাজনৈতিক ও সরকারি প্রচেষ্টার ফলেই স্বাধীনতা পরবর্তী আসামের সমাজ ও রাজনীতিতে বারবার সামাজিক অশান্তি ও ভাষাগত হিংসার জন্ম হয়েছে। স্বাধীনতার পর সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বঙ্গভাষী সমাজ ও তাদের ভাষাসংস্কৃতির প্রভাব নিয়ন্ত্রণের। এটা করতে গিয়ে কখনো চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অগণতান্ত্রিক ভাষা আইন। কখনো সরকারি প্রশ্রয়ে ভাষিক হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কখনো, যদিও বহির্বিশ্বে অপ্রচারিতই থেকে গেছে, সংগঠিতভাবে বঙ্গভাষী মানুষকে দেশান্তরে বাধ্য করা হয়েছে। কখনো বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলির চরিত্র বদল করা হয়েছে। কখনো সরকারি প্ররোচনায় ও উদ্যোগে বঙ্গভাষী মানুষের একটি বিশেষ অংশকে জনগণনায় নিজেদের পরিচয় বদল করতে বাধ্য করা হয়েছে।

> আসামে আজ যে সমস্ত মানুষের ওপর দেশহীনতার খাঁড়া ঝুলল তাদের উপর এই সর্বনাশ নেমে আসার কারণও একই। নিয়তির পরিহাস, একদিন যে ভূখণ্ড ছিল এক অভিন্ন রাষ্ট্রের অংশ, রাজনীতির পাশাখেলায় সেই ভূগোলের বিভাজিত দুটি অংশের একটি অঞ্চলের মানুষের ওপর অপর অঞ্চলে নেমে আসছে দেশহীনতার অভিশাপ। আসামের আজকের নাগরিকত্ব বিষয়ক সংকটের অন্তরালেও রয়েছে জাতিগত অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও হিংসার রাজনীতি।

সরকারি জনগণনার কর্মোদ্যোগকে স্থানীয় ভাষিক রাজনীতির অঙ্গীভূত করাটা আসামের রাজনীতির একটি উদ্ভাবন। এই রাজনীতির ফলে কোনো জনগণনায় বাঙালির একটি অংশের পরিচয় হয় অসমীয়া। পরবর্তী সময়ে আরেকটি জনগণনায় বাঙালিদের অন্য একটি অংশকে হিন্দিভাষী হিসেবে নিজেদের নথিভুক্ত করাতে সার্বিকভাবে উদ্যোগ নেয় সরকারি দলের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। এই সমস্ত উদ্যোগকেই ভক্তিতে নয়, ভয়ে মেনে নেন আক্রান্ত মানুষ। এই ঘটনাগুলির সার্থক রূপায়ণের প্রয়োজনেই প্রায় প্রতিটি দশকে একবার করে ভাষিক দাঙ্গার জন্ম দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৮ সালে এই ভাষা-রাজনীতি একটি চমকপ্রদ বাঁক নেয়। আসলে ওই সময়ে

আসামের নির্বাচনী রাজনীতিতে একটি চমকপ্রদ বাঁক পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের নিরিখে আসামের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতাহীন বামপন্থীরা মোট ১২৬টি আসনের মধ্যে ২৫টি আসনে জয়লাভ করে। পরিষদীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের এই চমকপ্রদ সংখ্যাগত অগ্রগতিকে কোনো এক অজানা কারণে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার নিবন্ধে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক অভিহিত করেন 'বাঙালিদের আধিপত্যবৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে'। এই বিষয়ে স্পর্শকাতর আসামের রাজনীতি এই নিবন্ধকে কেন্দ্র করে আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। রাজ্যের নানা প্রান্তে আনন্দবাজার পত্রিকার বহ্ন্যুৎসব হয়। বামপন্থা ও বাঙালিকে একাকার করে বাঙালি বিরোধী জিগিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য। আসামের রাজনীতিবিদ, সংবাদ মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে এই প্রচার শুরু হল যে প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যায় বঙ্গভাষী মানুষ আসামে 'অবৈধভাবে' অনুপ্রবেশ করেছে এবং এর ফলে আসামের ভাষা সংস্কৃতি ও জনবিন্যাস চিরতরে বিনষ্ট হতে চলেছে। কীসের ভিত্তিতে এই ধারণা হল বা কে বা কারা এবং কীভাবে এই হিসেবটি কষলেন সে ব্যাপারে খোলসা করার দায়িত্ব নিলেন না কেউই। এক তরফাভাবে প্রচার হতে থাকল, অনতিবিলম্বে এই মানুষগুলিকে চিহ্নিত করে দেশের সীমানার বাইরে নিক্ষেপ না করা অবধি এই রাজ্যের বাঁচার কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। কেউ বললেন সংখ্যাটা ২০ লক্ষ, কেউ ৪০ লক্ষ, কেউ ৬০ লক্ষ বলেও অভিহিত করলেন।

উন্মাদনা একবার তৈরি হয়ে গেলে তথ্যপ্রমাণের রাজনীতির কোনো পরিসর আর অবশিষ্ট থাকে না। কোনও জনগণনার প্রতিবেদনই এমন কোনো অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে না। এই অসহিষ্ণু ধারণার উৎকট প্রকাশের ফল হিসেবেই গোটা সত্তরের শেষ থেকে আশির দশকের মাঝ অবধি আসাম অবরুদ্ধ হয়ে থাকল উত্তাল আন্দোলনে। দাবি ১৯৫১ সালের পর আসাম রাজ্যে আসা সমস্ত বহিরাগতদের বহিষ্কার করতে হবে। এই সময়পর্বে আসাম শুধু অবরুদ্ধই হল না। বাঙালি বিরোধী হিংসার ঘটনা ছড়িয়ে পড়ল সারা রাজ্যে। চোরাগোপ্তা ব্যক্তিহত্যার ঘটনা, দলবেঁধে সংগঠিত হিংসাত্মক আক্রমণ থেকে শুরু করে একাধিক গণহত্যার ঘটনা ঘটল যেখানে এক রাতে প্রাণ হারিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। এমন ঘটলো গোটা সময়পর্ব জুড়েই। শুধুমাত্র ধারনার উপর নির্ভর করে এতটা দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলনের নামে অচলাবস্থা, অস্থিরতা ও হিংসাত্মক ঘটনার উদাহরণ স্বাধীন ভারতে আর দুটি নেই। আশ্চর্যের বিষয়, এমন অন্যায় ধারণানির্ভর অসত্যের উপর ভিত্তি করা আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৫ সালে। কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা সরকারি প্রতিবেদনকে যাচাই না করেই মেনে নিল যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে ১৯৭১ সালের পর বিপুল সংখ্যায় বঙ্গভাষীরা আসামে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন। যদিও আন্দোলনকারীদের দাবি অনুযায়ী বিদেশি নির্ধারণের ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ১৯৫১ সালকে সরকার মেনে নিল না। স্থির হল অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নির্ধারণের ভিত্তির দিনক্ষণ হবে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ রাত বারোটা। যুক্তি হল, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যেহেতু আত্মপ্রকাশের সময়ে বাংলাদেশ যেহেতু নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে ফলে ১৯৪৭ সালের দ্বিজাতি তত্ত্ব আর ওই দেশে প্রাসঙ্গিক থাকল না। বিভাজিত স্বদেশের বাস্তবতায় যে সংখ্যালঘু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তানে তাকে মান্যতা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকল না। আরো স্থির হল, ১৯৬৬ সাল অবধি যে সমস্ত ভোটার তালিকা রয়েছে সেখানে নাম থাকা সমস্ত মানুষদের সরাসরি ভারতীয় নাগরিক হিসেবে মান্যতা দেওয়া হবে। যে সমস্ত মানুষ ১৯৬৬ সালের পর এবং ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ রাত বারোটার আগে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসামে এসেছেন তাদের ১০ বছরের জন্যে ভোটাধিকার থাকবে না। এই সময়পর্বে আসা মানুষদের বিদেশি নাগরিক পঞ্জীয়কের কার্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এই নথিভুক্তি করলেই তারা ১০ বছর পর ভোটাধিকার ফিরে পাবেন। নাগরিক হিসেবে অন্যান্য অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হবেন না। কিন্তু ১৯৭১ সালের ওই নির্দিষ্ট তারিখের পর হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যারাই বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন তাদের চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার, আসাম সরকার ও আসামের আন্দোলনকারী সংগঠনগুলির মধ্যে এই ত্রিপাক্ষিক চুক্তিকে বলা হল 'আসাম চুক্তি'। এই চুক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজী করাতে পারার ফলে আন্দোলনকারীরা রাজ্যে 'বিজয়ী'র মর্যাদায় ভূষিত হলেন। আন্দোলনকারী সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে তৈরি করলেন রাজনৈতিক দল 'অসম গণপরিষদ'। ১৯৮৫ সালের নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করল আন্দোলনকারীরা। এখন বিদেশি নাগরিক চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব এসে পড়ল তাদের ঘাড়ে। আন্দোলনের সময় চিৎকার চেঁচামেচি করছিলেন তারা এই বলে যে আসামে অন্তত ৪০ লক্ষ বিদেশি নাগরিক রয়েছে। ক্ষমতায় এসে তারা মামলা দায়ের করতে পারলেন কয়েক লক্ষের বিরুদ্ধে মাত্র। একতরফা মামলাতেও কয়েক হাজারের বেশি মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করতে পারলেন না। ত্রুটিপূর্ণ একপক্ষীয় এই মামলাতেও শেষ পর্যন্ত বিদেশি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত হল মাত্র কয়েক শ মানুষ। বেশিরভাগই হতদরিদ্র, আইনীযুদ্ধে অপারগ। আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশের সাথে সরকারিভাবে সে দেশের নাগরিকদের অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের বিষয়ে কোনো আলোচনা হল না। মানুষকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে অবহিতও করা হল না। বিদেশি হিসেবি চিহ্নিত ওই কয়েক শ মানুষকে বিভিন্ন পর্যায়ে রাতের অন্ধকারে সীমান্তের ওপারে গলাধাক্কা দিয়ে বহিষ্কার করে দেওয়া হল। ওপারে গিয়ে তাদের ভাগ্যে কী জুটল কেউ জানল না। কেউ খোঁজও নিল না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অমানবিক আসাম চুক্তি বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে যখন দাঁড়ালো ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন, তখন সরকারি দলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে সংসদে আইনের সংশোধনী এনে শুধুমাত্র আসাম রাজ্যের জন্যে নাগরিকত্বের শর্তকে ভিন্ন করে দেওয়া হল। এতেও যখন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সন্তুষ্ট করার পর্যায়ে যাচ্ছে না। তখন সুপ্রিম কোর্টে সরকারি উদ্যোগের শিথিলতার অভিযোগ এনে মামলার মাধ্যমে জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর বর্তমান পর্যায়ের 'নবীকরণ' প্রক্রিয়া শুরু হল। শেষ পরিণতি ৪০ লক্ষ মানুষের মাথায় অ-ভারতীয়ত্বের কলঙ্ক চাপিয়ে দেওয়া।

> এখানে মূলত দুটি রাজনীতি ক্রিয়াশীল। একটি ভাষিক বিদ্বেষ এবং অপরটি ধর্মীয় বিদ্বেষের। ভাষিক বিদ্বেষের রাজনীতিটি রাজ্যগত। ধর্মীয় বিদ্বেষের রাজনীতিটি জাতীয় পর্যায়ের।

কেন এমন হল? কী সেই ইতিহাস যার জেরে শুধুমাত্র বঙ্গভাষী হওয়া অপরাধে এত বিশাল সংখ্যার মানুষকে এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে নিক্ষেপ করা? এর জন্যে পিছিয়ে যেতে হবে প্রায়

দুশো বছর। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আসামে প্রায় ছশো বছর ধরে রাজত্ব করে তাই-আহোম বংশোদ্ভুত আহোম রাজারা। বলা বাহুল্য, এরাও স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন না। এ ছাড়া তৎকালীন আসামে কখনো মুঘল শাসন সম্প্রসারিত হয় নি। ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা বারবার অভিযান চালিয়েও সফল হন নি। আহোম রাজত্বের শেষ দিকে আসাম বারবার বর্মীদের আক্রমণের শিকার হয়। আসাম অধিকার করে নেয় বর্মী রাজবংশ। হত্যা, লুণ্ঠন ছিল বর্মীর রাজত্বের বৈশিষ্ট্য। বর্মীদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেতে আহোমরা ব্রিটিশের সাহায্য প্রার্থনা করে। বর্মীদের সাথে একাধিক যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়। ১৮২৬ সালে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আসামকে যুক্ত করা হয় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সাথে। আসাম ছিল পশ্চাদপদ। অর্থনীতি ছিল দুর্বল। রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে খুব লাভজনক নয়। বঙ্গদেশে যেহেতু প্রায় সত্তর বছর আগেই ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফলে ইংরেজি শিক্ষিত একটি শ্রেণির জন্ম সেখানে তখন হয়ে গেছে। ব্রিটিশ শাসন আসামে সম্প্রসারিত হওয়ার পর বঙ্গদেশ থেকে দলে দলে আগমন হল করণিক, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, আইনজীবীদের। এরাই আসামের প্রথম বঙ্গভাষী প্রব্রজনকারী। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অঙ্গ এই মানুষেরা হয়ে উঠল আসামে মানুষের কাছে দৃশ্যমান শাসকবর্গ। ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি জন্ম নেওয়া ক্ষোভের একটা বড় অংশ পরিচালিত হল এঁদের বিরুদ্ধেই। এখান থেকেই আসামে অসমীয়া বাঙালি অবিশ্বাস ও দূরত্বের সূত্রপাত। এরপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন পঞ্চাশ বছর ধরে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয় যার সাথে প্রত্যক্ষভাবে বাঙালিদের সম্পৃক্ততা না থাকলেও এর থেকে বাঙালিদের প্রতি ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। ১৮৩৬ সালে ব্রিটিশ শাসকেরা আসামে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা চালু করে দেয়। পরের বছর ব্রিটিশরা সারা দেশেই প্রশাসনের ভাষা হিসাবে ফার্সিকে সরিয়ে নিচের তলায় স্থানীয় ভাষা ও ওপরের তলায় ইংরেজি ভাষা চালু করে। বঙ্গদেশে ফার্সি সরিয়ে বাংলা চালু হলেও আসামের ক্ষেত্রে তা দাঁড়ায় অসমীয়ার অপসারণের মধ্য দিয়ে বাংলার প্রবর্তন। এই দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাঙালিদের কোনো ভূমিকা ছিল না এটা অসমীয়া ইতিহাসবিদরাই গবেষণা করে দেখিয়েছেন। কিন্তু এই ঘটনায় অসমীয়াদের মধ্যে বাঙালিদের প্রতি বিরূপতা খুবই বেড়ে যায়। নবোদ্যত অসমীয়া বুদ্ধিজীবীরা অসমীয়া ভাষার পুনঃপ্রবর্তনের দাবি জানিয়ে নানা জায়গায় আবেদনপত্র পাঠাতে থাকেন। ৩৭ বছর প্রচলিত থাকার পর ১৮৭৩ সালে অসমীয়া ভাষা আবার চালু হয়।

> কেন হঠাৎ করে দেশের অন্য সব রাজ্য ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র আসামেই 'জাতীয়' নাগরিক পঞ্জীর 'নবীকরণ' প্রক্রিয়া চলছে? এখানে 'জাতীয়' ও 'নবীকরণ' কথাটিতে উদ্ধৃতিচিহ্ন রাখতে হচ্ছে।

১৮৭৪ সালে বঙ্গদেশ থেকে বিযুক্ত করে যখন স্বতন্ত্র আসাম প্রদেশ গঠন করা হয় তখন আসামের ঘাটতি পূরণের জন্যে বঙ্গদেশের দু'টি রাজস্ব সমৃদ্ধ অঞ্চলকে নতুন প্রদেশে যুক্ত করা হয়। তা হল গোয়ালপাড়া মহকুমা ও সুরমা উপত্যকার সিলেট ও কাছাড় জেলা। এতে আসামে জনসংখ্যার ভারসাম্য বাঙালিদের দিকে ঝুঁকে গেল। এই সিদ্ধান্তে অসমীয়ারা যতটা অসন্তুষ্ট হন, ততটাই অসন্তুষ্ট ছিলেন সিলেট ও কাছাড়ের বঙ্গভাষীরা। এই অঞ্চলে প্রথমবারের মত সমিতি গঠন করে সিলেট ও কাছাড়ের মানুষ ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে দরখাস্ত পাঠালেন। অসমীয়া ও বাঙালি দু পক্ষেই ছিল ভাষা সংস্কৃতির আশঙ্কা। অসমীয়ারা ভয় পেয়েছেন এই বিপুল জনসংখ্যার বঙ্গভাষী অঞ্চলের সংযুক্তিতে তাদের ভাষা সংস্কৃতি বিপদাপন্ন হবে। আর বাঙালিরা ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন বাংলা থেকে বিযুক্ত করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আবহমান বাংলার সাথে নাড়ির যোগ চিরতরে ছিন্ন হওয়ার ভয়। ব্রিটিশ প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে এবার আর বঙ্গভাষী মানুষের প্রব্রজন হল না। বঙ্গদেশের মাটিই যুক্ত হল আসামে। ফলে এই অঞ্চলের মানুষকে আর বহিরাগত বলার সুযোগ রইল না। কারণ 'বাহির'টাই আসামে 'আগত' হয়েছে। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে আসামের রাজস্ব খুবই কম ছিল। আসামের চাষীরা জলাজমিতে চাষ করতে জানতেন না। ফলে অনাবাদী জমির পরিমাণ ছিল বিপুল। অন্যদিকে বঙ্গদেশে ময়মনসিংহ জেলায় জমি পিছু তখন কৃষকদের বিশাল জনসংখ্যার ভার। কৃষক আছে জমি নেই। আসামে জমি আছে কিন্তু কৃষক নেই। ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিল ময়মনসিংহ জেলা থেকে আগ্রহী কৃষকদের আসামে বসতি দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে দলে দলে পূর্ববঙ্গ থেকে পরিশ্রমী কৃষকেরা আসামে পাড়ি জমালেন। এরা এসেই আসামের কৃষির চেহারা পাল্টে দিলেন। প্রথম অবস্থায় ১৯০৪-১৯১১ এই সময়পর্বে ৫৫,০০০ কৃষকদের আনা হয়। আসামের জলাজমিতে চাষবাস করার ফলে আসামের খাদ্য উৎপাদনে গুণগত পরিবর্তন এলো। পাটচাষ আসামে হত না। পাটচাষও শুরু হল। খাদ্য উৎপাদনে এই বৃদ্ধি আসামের অর্থনীতিতে বিশাল কর্মচাঞ্চল্য এনে দেয়। অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজও বাঙালি মুসলমান কৃষকদের আসামে বসতি স্থাপন করানোর সিদ্ধান্তকে প্রথম অবস্থায় স্বাগত জানাল। আসামের অনাবাদী জমিতে বসতি দেওয়া বঙ্গভাষী কৃষকদের সংখ্যা ক্রমেই ৫৫,০০০ থেকে বেড়ে ১৯২১-৩১ এর সময়কালে যখন ৫,৭৫,০০০ দাঁড়ালো তখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজে। তাঁদের ধারণা হল অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য ও সমৃদ্ধি এলেও এই প্রব্রজন চলতে থাকলে অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আসাম রাজ্য অসমীয়ারই একমাত্র, এই মনোভাব ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী আসামে ক্রমে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা এই মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করলেন।

১৯৩৭ সালে জওহরলাল নেহরু আসাম সফরে এলে 'অসমীয়া সংরক্ষিণী সভা' ও 'অসমীয়া ডেকা দল' নামে দুটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে দুটি স্মারকপত্র দেওয়া হয়। প্রথম স্মারকপত্রে বলা হয়, আসামের জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বাঁচাতে অসমীয়া বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের কথা ভাবছেন। দ্বিতীয় স্মারকপত্রে বলা হয়, অসমীয়া জাতিকে রক্ষা করতে জরুরি ভিত্তিতে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। ১) সিলেটকে বাংলায় ফিরিয়ে দেওয়া। ২) কুড়ি বছরের জন্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালি বহিরাগমন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। ৩) বহিরাগত বাঙালিদের বাধ্যতামূলক স্থানীয় ভাষা সংস্কৃতি গ্রহণের আইনী নির্দেশনামার ব্যবস্থা করা। এই সময়কালে সারাদেশের মত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সাথে, স্থানীয় শাসনের পরিসর বিভাজন করে আসামেও দ্বৈত ক্ষমতা-কাঠামোর ভিত্তিতে পরিষদীয় রাজনীতি সম্প্রসারিত হল। এর ফলে বঙ্গভাষী সুরমা উপত্যকা ও অসমীয়া প্রধান আসাম উপত্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বাঙালি অসমীয়া সম্পর্কে ছায়া ফেলতে শুরু করল। আসামের প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সময় থেকেই তৎপর হয়ে উঠলেন, ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করলে স্বাধীন দেশের প্রশাসনে কীভাবে বাঙালিদের প্রভাব হ্রাস করা যায়। এই উদ্বেগ থেকেই

নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে আসামের বঙ্গভাষী এলাকা, বিশেষত সিলেটের অন্তর্ভুক্তির বিষয়েই বেশি আগ্রহী হয়ে উঠলেন গোপীনাথ বরদলৈর নেতৃত্বে প্রদেশের কংগ্রেস নেতারা। রাজনৈতিক ক্ষমতার দখলদারিত্ব নিয়ে সুরমা উপত্যকার কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার (তখন আসাম উপত্যকা বলা হত) কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে সংঘাতের যে সূচনা হয়, তার মাধ্যমেও অসমীয়া বাঙালি সংঘাতে বাড়বাড়ন্ত এলো।

দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পূর্ব লগ্নে শেষবারের মত ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখার প্রস্তাব এসেছিল ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবের মাধ্যমে। সেখানে ভারতকে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে তিনটি গ্রুপিং বা সমষ্টিতে ভাগ করার প্রস্তাব ছিল। 'ক' ভাগে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলি, 'খ' ভাগে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলি এবং 'গ' ভাগে হিন্দু মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত কাছাকাছি থাকা রাজ্য বাংলা ও আসাম। একটি কেন্দ্রীয় সংবিধান পরিষদ থাকা ছাড়াও প্রতিটি সমষ্টি ও রাজ্যেরও আলাদা সংবিধান পরিষদ থাকার প্রস্তাব ছিল। রাজ্যগুলিকে দশ বছর পর তার নিজস্ব সমষ্টি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকারও প্রস্তাবিত হয়েছিল। মূলত আসাম ও পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতৃত্বের তীব্র আপত্তিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারতের বিভক্তি রোধ করার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। স্বাধীনতা-উত্তর আসামের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈর নেতৃত্বে আসামের প্রদেশ কংগ্রেস ভেবে নিলো বাংলার সাথে অভিন্ন গ্রুপিং বা সমষ্টিতে যুক্ত থাকলে বঙ্গভাষীরাই শেষ পর্যন্ত মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবে। দেশভাগ অনিবার্য হয়ে উঠলে আসামের অসমীয়াভাষী কংগ্রেস নেতারা চাইলেন সিলেট পাকিস্তানে চলে যাক। সিলেটের বাঙালি কংগ্রেস নেতারা যারা আগে আসামে থাকার চেয়ে বঙ্গদেশে পুনর্ভুক্তির পক্ষে সোচ্চার ছিলেন, তারা চাইলেন সিলেট আসামে থাকুক। এটা একটা অদ্ভুত বৈপরীত্য। ১৮৭৪ সালে অবিভক্ত বঙ্গদেশ থেকে সিলেটকে পৃথক করে আসাম প্রদেশে যুক্ত করার সময় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সিলেটের নেতারা সহ সমগ্র বঙ্গভাষী সমাজ। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলা হয়েছিল, সিলেট নামক এক দুধেল গাইকে নবগঠিত আসাম প্রদেশের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরো সময়পর্ব জুড়ে সিলেট ও কাছাড়ের কংগ্রেস জেলা কমিটি বঙ্গীয় কংগ্রেস প্রাদেশিক কমিটির আওতাভুক্ত ছিল, যদিও আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতেও আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে যোগ দিতেন এই অঞ্চলের নেতারা। অন্যদিকে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর জনসংখ্যার অনুপাতের বিবেচনায় সিলেটের মুসলিম নেতারা আসাম প্রদেশের সঙ্গে থাকাকে শ্রেয়তর ভেবেছিলেন। কিন্তু দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে এই দুটি পক্ষের অবস্থান একশো আশি ডিগ্রি বদল হয়ে গেল। মুসলিম লিগ নেতারা চাইলেন সিলেট পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হোক। সিলেটের কংগ্রেস নেতারা চাইলেন সিলেট আসামে থাকুক। সিলেটের মুসলিম লিগ ও আসামের প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের অবস্থান একই বিন্দুতে চলে এলো। যে গণভোটে সিলেটের ভাগ্য নির্ধারিত হল তাতে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্ব সিলেটের কংগ্রেস নেতাদের পাশে দাঁড়ালেন না। গণভোটের পর সিলেট পুরোপুরি পাকিস্তানে চলে গেলেও পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার সাথে অবশিষ্ট ভারতের অবিচ্ছিন্ন ভূতল যোগাযোগের স্বার্থে র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার মাধ্যমে সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমা ভারতে যুক্ত করা হয়। আসামের প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্ব চেয়েছিলেন বঙ্গভাষী সিলেট ও কাছাড়ের পুরোটাই পাকিস্তানে চলে যাক। ফলে সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমা ও কাছাড় জেলাকে নিয়ে নবগঠিত কাছাড় জেলা ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসাম রাজ্যের অংশ হলে এতে অসন্তুষ্টই আসামের অসমীয়াভাষী কংগ্রেস নেতারা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে আসাম বিধানসভার অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল আকবর হায়দরী যতটা ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্তির আনন্দ ব্যক্ত করেছেন, ততটাই উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন 'বাঙালিদের অধীনতা' থেকে মুক্তির আনন্দে। পত্রপত্রিকায়, নানা সামাজিক সংগঠনের নেতারা নিবন্ধ লিখতে গিয়ে, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে এই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ করেছেন, ক্যান্সারের মত সঙ্গে রয়ে গেল বঙ্গভাষী কাছাড় জেলা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক সময় থেকেই খন্ডিত দেশের দুই প্রান্তেই সাম্প্রদায়িক হিংসা, হত্যা, সম্পত্তি দখল ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে থাকে। এক পারের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তরা অপর পারে গেলেই এই বাস্তুহারা মানুষের উপস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় সেই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়িয়েছে। এই হিংসা দু'পারেই অনিয়ন্ত্রিত ভাবে গুণাত্মক হারে বাড়তে থাকে। এমনই এক সাম্প্রদায়িক হিংসায় আক্রান্ত হত আসামের অভিবাসী বঙ্গভাষী মুসলমান কৃষক সমাজ। প্রায় ছয়/ সাত হাজার মানুষ নিহত হয় এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। আতঙ্কিত হয়ে অসংখ্য মানুষ প্রাণ বাঁচাতে পাড়ি দেন পূর্ব পাকিস্তানে।

দু'পারেই হিংসা নিয়ন্ত্রণের অতীত হয়ে গেলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান নতুন দিল্লিতে এসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেন। এই আলোচনা পাকিস্তানের তরফে বেশি জরুরি ছিল এ জন্যেই তাঁদের বিবেচনায়, কারণ পাকিস্তানের সমস্ত হিন্দু ভারতে চলে এলেও বিশাল দেশ ভারতে এদের স্থান দেওয়াটা হয়ত সমস্যা হবে না। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে ভারত অংশের সমস্ত মুসলমান পাকিস্তানে চলে গেলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে সেই জনসংখ্যার চাপ সামলানো সম্ভব হবে না। দিল্লিতে নেহরু-লিয়াকতের মধ্যে ছ'দিন ব্যাপী আলোচনার শেষে দিল্লি চুক্তি বা নেহরু-লিয়াকত চুক্তি নামে একটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তান তাদের নিজের রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সিদ্ধান্ত হয়, সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়ে বিধিবদ্ধভাবে দেখাশোনার জন্যে দুটি দেশেই সংখ্যালঘু কমিশন গঠিত হবে। তাছাড়া, যে সমস্ত মানুষ নিরাপত্তাজনিত কারণে দেশত্যাগী হয়েছেন তাঁরা ফিরে আসতে চাইলে সংশ্লিষ্ট সরকার তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে। তাঁরা যদি আর ফিরতে না চান তবে তাঁদের দখলীকৃত সম্পত্তি সম্মানজনকভাবে বিক্রি করতে সাহায্যের হাত বাড়াবে সরকার। এই চুক্তির ধারা অনুযায়ী আসামের দেশত্যাগী বঙ্গভাষী

১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ প্রশাসন যখন চিফ কমিশনারের অধীন আসাম রাজ্যের জন্ম দেয় তখন তাতে এমন সব অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে যা কখনোই প্রাচীন আসামে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোনোটি ছিল পার্বত্য স্থানীয় রাজাদের সার্বভৌম রাজ্য। কোনো অঞ্চল ছিল বৃহত্তর বঙ্গদেশের অবিচ্ছেদ্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অংশ। কেউ ত্রিপুরা বা কোচ রাজ্যের অধীন। যে প্রধান দুটি অংশ নিয়ে আধুনিক আসাম তৈরি হয় তা অসমীয়াভাষী অধ্যুষিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও বঙ্গভাষী অধ্যুষিত সুরমা উপত্যকা।

মুসলিম কৃষকদের একটি বড় অংশ আবার আসামে ফিরে আসে। স্বাধীনতা উত্তর আসামের রাজ্য সরকারের তখন অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হিসেবে উঠে এসেছে রাজ্যে ভাষিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ আমলেও আসামের কোনো অংশেই কোনো একটি ভাষাগোষ্ঠীর সামগ্রিক আধিপত্য ছিল না। কিন্তু আসামের শাসক দল ও তাঁদের সমর্থক অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজের ধারণা জন্মালো যে রাজ্যকে একটি একভাষী রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে অসমীয়া ভাষা, সংস্কৃতি ও সর্বোপরি অসমীয়া সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই ধারণা থেকেই গৃহীত হল কিছু নীতি এবং কিছু কৌশল।

১৯৩১ সালের জনগণনায় আসামে বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অসমীয়াভাষী মানুষ ছিলেন ৩১%। স্বাধীনতার পর জনসংখ্যার ভারসাম্যের পরিবর্তন করার লক্ষ্যে প্রথমেই লক্ষ্যবস্তু করা হল অভিবাসী বাঙালি মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়কে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালোদিনগুলির স্মৃতি তখনও তাদের মনে দগদগ করছে। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে তাদের আন্দোলন সংগ্রামে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই মৌলানা ভাসানী তখন পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেছেন। নেতৃত্বহীন এই পূর্ববঙ্গমূলের বঙ্গভাষী মুসলিমদের সরকারি জনগণনায় নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে অসমীয়াভাষী হিসেবে পঞ্জীকরণের জন্যে ব্যাপক অভিযান চালানো হল। ভাষিক পরিচয় বদলের এই রাজনৈতিক অভিযান সংগঠিত হল আসামের কংগ্রেস নেতা পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলি আহমেদের নেতৃত্বে। এই অভিযানের প্রভাবে ১৯৫১ সালের জনগণনায় এই বঙ্গভাষী মুসলিমরা ব্যাপক হারে নিজেদের অসমীয়াভাষী হিসেবে পঞ্জীকরণ করলেন। রাজনৈতিক উদ্যোগে এই গণহারে ভাষিক পরিবর্তনের ঘটনার পরে দেখা গেল আসামে অসমীয়াভাষীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৫৬.৭%। এই রাজনৈতিক ভোজবাজীটিকে আসামের তৎকালীন সেন্সাস কমিশনার ভাগাওয়ালা বলেছিলেন 'বায়োলজিক্যাল ওয়ান্ডার'। আসামের রাজনীতিতে এই ঘটনাটি অসমীয়া ও বাঙালি সমাজে দু'ভাগে দেখা হয় স্বাভাবিকভাবেই। আসামের অসমীয়া উগ্র জাতীয়তাবাদীরা শুধু নয়, অনেক প্রগতিশীল অসমীয়ারাও রাজনৈতিক উদ্যোগে সংগঠিত এই ভাষিক পরিচয় পরিবর্তনের ঘটনাকে 'সাংস্কৃতিক সমন্বয়' হিসেবে অভিহিত করেন। বাঙালিরা স্বাভাবিক ভাবেই একে দেখেন ভাষিক আগ্রাসন হিসেবে।

> ১৯৭৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের নিরিখে আসামের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতাহীন বামপন্থীরা মোট ১২৬টি আসনের মধ্যে ২৫টি আসনে জয়লাভ করে। পরিষদীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের এই চমকপ্রদ সংখ্যাগত অগ্রগতিকে কোনো এক অজানা কারণে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার নিবন্ধে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক অভিহিত করেন 'বাঙালিদের আধিপত্যবৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে'। এই বিষয়ে স্পর্শকাতর আসামের রাজনীতি এই নিবন্ধকে কেন্দ্র করে আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।

স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৪৫ সালে আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছিল, 'যদি আসাম প্রদেশকে অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠন না করা হয়, তবে জাতি হিসেবে অসমীয়া ও তার সংস্কৃতি বাঁচানো অসম্ভব। বঙ্গভাষী সিলেট ও কাছাড়ের সংযুক্তি এবং পতিত জমিতে লক্ষ লক্ষ বাঙালি বসতকারীদের আগমন বা আনয়ন আসামের সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতাকে বিনষ্ট করবে। প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এর ফলে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েই গেছে।' স্বাধীনতা-উত্তর আসামের প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল উগ্র ভাষিক সংকীর্ণতা। নানা ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে যে ভৌগোলিক খণ্ডটি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আসাম প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল, এর ভাষিক বহুত্ব ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে অস্বীকার করা হয়ে দাঁড়াল আসামের শাসকশ্রেণির রাজনীতি। এই আসাম যে ব্রিটিশপূর্ব আহোম রাজত্বের আসাম নয়, এটা তারা মানসিকভাবে মেনে নিতে পারলেন না। আজকের আসামের নানা ভাষা সংস্কৃতির বহুত্বকে অস্বীকার করা যে অসম্ভব সেই বাস্তবতাটুকুরও স্বীকৃতি থাকল না সরকারি নীতিমালায়। মানসিকভাবে অসমীয়া ভাষা ও জাতির 'গৌরবময় অতীত' ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই বহুভাষী আসামকে একভাষী রাজ্যে পরিণত করার জন্যে অসমীয়া উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন ও সরকার হাতে হাত মিলিয়ে এগোতে থাকে। প্রথমে বিষয়টা ছিল একই সাথে ভাষিক বিদ্বেষ, ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং কমিউনিস্ট বিদ্বেষ।

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে যখন ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন 'অসম সাহিত্য সভা'র অধিবেশনের প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতি এবং আসামের অগ্রণী বুদ্ধিজীবী অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী বলেছিলেন, 'সূত্রগুলির (আসামের শংকরীয়া ধর্মের উপাসনালয়- নিবন্ধাকার) প্রতি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে রামকৃষ্ণ মিশন, গৌড়ীয় মঠ, ভারত সেবাশ্রম, মুন্সি-মৌলবী-পাদ্রীরা আসামের পার্বত্য জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে বিপুল উদ্যমে অসমীয়া বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন।... আসামবাসী বাঙালিরা ব্রিটিশের চেয়ে অসমীয়াভাষীদের প্রতি বেশি শত্রুতামূলক আচরণ করেছে এই ধারণা আত্মরক্ষাকামী অসমীয়া মানুষের মনে দৃঢ় হচ্ছে।...শান্তিশৃঙ্খলা নিরাপত্তা চেয়ে বঙ্গদেশ থেকে যারা আসামে আসছেন, তাদের দুটিই উদ্দেশ্য। একটা ধর্মোন্মাদী, আরেকটা ভাষা-উন্মাদী। ধর্মোন্মত্ত পাকিস্তানী মুসলমানদের অভিসন্ধি, আসামে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়ে আসামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা। আর, ভাষা-উন্মাদী বাঙালিদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আসামে বঙ্গভাষীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে আসামকে বৃহত্তর বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত করা।... হে অসমীয়া জনগণ, পর্বত ও সমতলের হে প্রিয় অসমীয়া ভাইবোন, আজ আপনার দেশ, আপনার অস্তিত্ব কমিউনিস্ট, পাকিস্তানিস্ট, বেঙ্গলিস্ট এই তিনটি শত্রুর দ্বারা ভীষণ ভাবে আক্রান্ত। এই আক্রমণে কমিউনিস্টরা জয়ী হলে আপনি মস্কোর দাস হবেন, পাকিস্তানিস্টরা জয়ী হলে হবেন পাকিস্তানের দাস, বেঙ্গলিস্টরা জয়ী হলে আপনি বঙ্গদেশের দাসত্বের অধীন হবেন।..'

ময়মনসিংহ মূলের বাঙালি মুসলমানদের অসমীয়াভাষী হিসেবে পঞ্জীকৃত করতে সমর্থ হওয়ার পর ধর্মীয় বিদ্বেষের জায়গায় সামান্য পরিবর্তন এলো। এই নতুন করে হওয়া অসমীয়া জনগোষ্ঠীকে তাঁরা অভিহিত করলেন 'ন-অসমীয়া' নামে। পঞ্চাশের দশকের শেষ ও ষাটের শুরুতে যে ভাষিক বিদ্বেষ ও হিংসার ঘটনাবলী সারা আসামে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে এই 'ন-অসমীয়া' জনগোষ্ঠীর মানুষদের ঠেলে দেওয়া হল বাঙালি বিরোধী অভিযানের সামনের সারিতে। ফলে বাঙালি মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে একটি অবিশ্বাসের ভূমি তৈরি করা

সহজতর হয়ে গেল। একটি কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশভাগের পর যে নতুন আসাম রাজ্যের গঠন হল সেখানে বঙ্গভাষী কাছাড় ও গোয়ালপাড়া ছাড়াও ছিল খাসি-জয়ন্তীয়া পাহাড়, গারো পাহাড়, উত্তর কাছাড়, মিকির পাহাড় ও লুসাই পাহাড় জেলাগুলি যে অঞ্চলগুলিকে কোনো ভাবেই অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির অঞ্চল বলা যাবে না। অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরীরা 'পর্বত ও সমতলের অসমীয়া বন্ধুরা' সম্বোধন করার সময় এই পার্বত্য জেলাগুলির অনসমীয়া জনগোষ্ঠীকেও ধরে নিয়েছিলেন অসমীয়া হিসেবে। তাঁদের মূল আপত্তিটা ছিল বঙ্গভাষীদের নিয়েই, যার জন্যেই অসমীয়া ভাষায় 'বঙাল' কথাটি ঘৃণার্থে বহিরাগত অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

'বঙ্গভাষী' মাত্রেই 'বঙাল' নয় এমন একটি কথা বলে একদা কংগ্রেস নেতা দেবকান্ত বরুয়া রবীন্দ্রনাথের 'ছোট ইংরাজ, বড় ইংরাজ' গোছের যুক্তি দিয়ে বিষয়টিকে নির্দোষ চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আসামে অসমীয়ারা যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নন এ কথা স্বীকার করে ১৯৫৩ সালের ২৩ এপ্রিল নলবাড়ীতে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আসামের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মতিরাম বরা বলেন, 'আসামের ৯৬ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ মানুষ খাঁটি অসমীয়া'। এ খবর 'আসাম ট্রিবিউন' পত্রিকার ৫ মে, ১৯৫৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আসামকে একভাষা ও এক সংস্কৃতির রাজ্যে পরিণত করতে ব্রিটিশের বিভাজনের কৌশলকেই মাথায় তুলে নেওয়া হল। কাছে টেনে নেওয়া হল বহিরাগত বাঙালি মুসলিমদের। আসামের একভাষী পরিচয় প্রতিষ্ঠায় মরিয়া আসামের শাসকশ্রেণি গত শতকের ছয়ের দশকের শেষে বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রথম বহিঃপ্রকাশে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আসামের আদি বাসিন্দা এই ভাষাগোষ্ঠী অসমীয়া জাতিসত্তায় মিশে যাবে এই প্রত্যাশায় আঘাত আসে প্লেইনস ট্রাইবেল কাউন্সিল অব আসাম বা পিটিসিএ-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বোড়োভাষী মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। এর প্রভাব সরাসরি পড়ে ১৯৭১ সালের জনগণনায়। আসামের অসমীয়া জনসংখ্যার আধিপত্য অব্যাহত রাখতে এবার নজর পড়ে আসামের চা বাগানগুলিতে। এটা সকলেরই জানা, আসামের বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যে চা বাগিচাগুলি রয়েছে তার শ্রমিকদের সকলেই বহিরাগত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সাদরিভাষী চা শ্রমিকরা এসেছেন মূলত ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে এবং বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকরা এসেছেন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং আজকের বিহারের মানভূম অঞ্চল থেকে। দক্ষিণ ভারত থেকে আসা কিছু জনগোষ্ঠীও রয়েছেন বরাক ও ব্রহ্মপুত্রের চা বাগানে। বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকরা মূলত বঙ্গভাষী। বরাকের চা বাগানগুলিতে বাংলার যে আঞ্চলিক রূপ কথ্যভাষা হিসেবে প্রচলিত তাকে চা শ্রমিকেরা 'বর্ধমানী' বলে অভিহিত করেন। আসামের জনসংখ্যায় অসমীয়া ভাষার আধিপত্য ও বঙ্গভাষী জনসংখ্যার সংকোচনের পরিকল্পনা নিয়ে আইএনটিউসি-র উদ্যোগে ১৯৭১ সালের জনগণনায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা শ্রমিকদের অসমীয়াভাষী হিসেবে এবং বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকদের হিন্দিভাষী হিসেবে পঞ্জীকরণ করানো হয়। এর একটি হাস্যকর ফলাফল এই যে, ভূ-ভারতে একমাত্র বরাক উপত্যকাতেই চা শ্রমিকদের ভাদু-টুসু গান হিন্দি লোকসঙ্গীত হিসেবে পরিচিত। আসামের রাজনীতিতে বিজেপির বাড়বাড়ন্তের সঙ্গেসঙ্গেই আসামের ভাষা-রাজনীতি ধর্মের মুখোস পড়েছে। বিগত জনগণনা থেকেই আসামে শুরু হয়েছে একটি সংগঠিত প্রচার। বলা হচ্ছে, আসামে ভাষা-পরিচয় পরিবর্তনকারী ময়মনসিংহমূলের বাঙালি মুসলিমরা যদি আবার বাঙালি পরিচয়ে ফিরে যায় তবে আসাম ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয়ে এই অঞ্চলে ইসলামি শাসন প্রবর্তন করবে। তাই ধর্মরক্ষায় অসমীয়া হিন্দুদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে বাঙালি হিন্দুদের জনগণনায় নিজেদের অসমীয়াভাষী হিসেবে পঞ্জীভুক্ত করতে হবে। আসামের ভাষা-রাজনীতি ও জনগণনার এটাই বিচিত্র সম্পর্ক।

এ তো গেল ইতিহাসের কথা। এখন প্রশ্ন উঠবে এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে আসামের নাগরিকত্ব বিষয়ক সমস্যা, সেখান থেকে ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোবে? এটা ঠিক যে ৪০ লক্ষ মানুষের নাম নাগরিক পঞ্জীর চূড়ান্ত খসড়ায় বাদ গেলেও নানা পর্যায়ে আইনী আবেদন নিবেদনের পর এই সংখ্যাটা অনেকটাই কমবে। কমে এই সংখ্যাটা এক দুই লক্ষ দাঁড়াক বা ১০ লক্ষ বা ২০ লক্ষই দাঁড়াক, বা কয়েক হাজারই দাঁড়াক, এই মানুষগুলির কী হবে? 'আসাম চুক্তি'তে কেন্দ্রীয় সরকার আসামের সে সময়ের আন্দোলনকারীদের কাছে অঙ্গীকার করেছিল যারা বিদেশি হিসেবে শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত হবে, তাদের এই দেশ থেকে বহিষ্কার হবে। বহিষ্কার হবে কোথায়? আসামের রাজনীতিতে বা এখানকার সরকারি ঘোষণায় এটাই বলা হয়েছে, এদের ফেরৎ পাঠানো হবে বাংলাদেশে। কারণ আসামে বিদেশি বলতে কার্যত বাংলাদেশ থেকে আসা লোকদেরই বোঝায়। মায়ানমার বা নেপাল থেকে আসা লোকদের নিয়ে আসামের রাজনীতি ততটা ভাবিত নয়। কারণ এখানে আশঙ্কাটাই হচ্ছে বাঙালিদের আগমনের ফলে স্থানীয় ভাষা সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটবে। ফলে বহিষ্কার মানে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো। এটা কী ভাবে বাস্তবায়িত হবে? আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দু'টি দেশের মধ্যে এ সম্পর্কে আলোচনা বা পারস্পরিক সমঝোতা বা চুক্তি ছাড়া এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে ভারত সরকারের কোনো কূটনৈতিক উদ্যোগের কথা আজ পর্যন্ত শোনা যায় নি। বাংলাদেশের সরকার এই কথাটা মান্যতাই দেন না যে তাদের দেশ থেকে অবৈধ ভাবে মানুষেরা ভারতে আসে।

> আশ্চর্যের বিষয়, এমন অন্যায় ধারণানির্ভর অসত্যের উপর ভিত্তি করা আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৫ সালে। কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা সরকারি প্রতিবেদনকে যাচাই না করেই মেনে নিল যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে ১৯৭১ সালের পর বিপুল সংখ্যায় বঙ্গভাষীরা আসামে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, আজ অবধি ভারতে সরকারের তরফ থেকেও এই বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। বরং এর বিপরীতে সংবাদ মাধ্যমের প্রকাশিত সংবাদ থেকে এটাই জানা গেছে যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে ভারত থেকে কোনো মানুষকেই সে দেশে ফেরৎ পাঠানো হবে না। এই কথা যদি সত্য হয়, তবে কী হবে এই বাদ পরা মানুষগুলির? ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের নাগরিকত্ব আইনে যে সংশোধনী আনার প্রস্তাব দেন, তাতে বলা হয়েছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশে থেকে কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধ, শিখ, জৈন , পার্সি বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মীয় লাঞ্ছনার শিকার হয়ে অবৈধ ভাবে ভারতে এলেও ভারত তাদেরকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গণ্য করবে না। ভারতে একাট নির্দিষ্ট

সময় থাকার পর বিধিবদ্ধভাবে নাগরিকত্বের জন্যে আবেদন জানালে তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। এমনিতে শুনলে মনে হবে এভাবে এই সমস্যার সমাধান হয়েই যাবে। কিন্তু বিষয়টা এতটা সহজ নয়। কারণ বহুবিধ। প্রথমত, ভারতের সংবিধানে ধর্মের ভিত্তিতে একটি অংশের মানুষকে নাগরিকত্ব আইনে বিশেষ সুযোগ দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। এমন কোনো আইন আইনসভায় পাশ হলেও সর্বোচ্চ আদালতে এ বিষয়ে কোনো মামলা হলে, এই আইন সংবিধানের মৌলিক বিধির সাথে সাংঘর্ষিক বিবেচনায় বাতিল হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, আসামের যে স্থানীয় অধিবাসীদের জাতিগত ক্ষোভ প্রশমনের জন্যে নাগরিক পঞ্জী নবীকরণের মত একটি বিশাল কর্মকাণ্ডে হাত দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, সেই মানুষগুলিরই নাগরিকত্ব আইনের এই সংশোধনী নিয়ে তীব্র বিরোধিতা রয়েছে। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে ব্যাপক ক্ষোভ বিক্ষোভের জন্ম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ নিয়ে এই মুহূর্তে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় সমস্ত রাজ্যই উত্তাল হয়ে আছে। ফলে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে যদি এই সংশোধনী পাশ করে দেওয়াও হয়, তবে শতাব্দী প্রাচীন যে অশান্তি প্রশমনের জন্যে এই বিপুল কর্মকাণ্ড তা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। জাতিগত হিংসার রাজনীতি নতুন করে ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত রাজ্যে। তা ছাড়া, আইনের বিধান শুনতে সরল হলেও, এর সুযোগ নেওয়া সাধারণ মানুষের জন্যে ততটা সহজ হবে না। প্রথমত, প্রস্তাবিত এই আইনের বিধান অনুযায়ী এই সুযোগ থাকবে শুধুমাত্র ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আসা মানুষদের জন্যেই। এই আইন বলবৎ হওয়ার পর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে যদি নতুন করে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে তখন এই আইনের সুযোগ নিয়ে নির্যাতিত মানুষের ভারতে চলে আসার কোনো সুযোগ থাকবে না। দ্বিতীয়ত, এই আইন তাদের জন্যেই প্রযোজ্য যারা ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ওই দেশগুলি থেকে ভারতে এসেছেন। অন্য কোনো কারণে এ দেশে চলে এলে এই আইন তাদের জন্যে কার্যকর হবে না। ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে আসার ব্যাপারটি নথিপত্র দিয়ে প্রমাণ করা অতটা সহজ ব্যাপার নয়। সবচেয়ে বড় কথা, যারা এ দেশে চলে এসেছেন আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে, তারা কীভাবে এতদিন আগে তাদের উপর নির্যাতনের গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হাজির করবেন। ফলে এই আইন পাশ করা যতটা কঠিন, তারচেয়ে বেশি কঠিন এর বাস্তবায়ন। বর্তমান আইনে বাদ পরা মানুষদের বন্দী শিবিরে আটক করে রাখার কথা। বন্দী শিবিরে এই মুহূর্তে রয়েছেনও কয়েক হাজার মানুষ যেখানে মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার ন্যূনতম ব্যবস্থাও নেই। অসহায় এই মানুষগুলির একাধিক জন ইতোমধ্যে আত্মহত্যা করেছেন। এই মানুষগুলি কেউই অপরাধমূলক কোনো কাজ করেন নি। শুধু এক সময়ের অখণ্ড স্বদেশেরই একটি অংশ থেকে অপর অংশে তারা চলে গেছেন। অথচ এই 'অপরাধ' করার জন্যে তাদের যেখানে বন্দী করা হচ্ছে যার সার্বিক পরিবেশ কারাগারের চেয়েও খারাপ।

কারাগারে একজন বন্দী অপরাধী যতটা মানবাধিকার পান, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জন্যে নির্দিষ্ট বন্দী শিবিরে তাও নেই। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ২০১৪ সালে নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় এলে বন্দী শিবির তুলে দেওয়া হবে। সন্দেহজনক ভোটার বা 'ডি-ভোটার' হিসেবে বিদেশি হিসেবে অভিযুক্ত মানুষদের অভিহিত করার যে ব্যবস্থা রয়েছে তারও তারা অবসান ঘটাবেন। কার্যক্ষেত্রে এর একটিও হয় নি। উল্টো নতুন করে আরো ১০০ টি বন্দী শিবির তৈরির জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার বাজেট বরাদ্দ করেছে। ফলে শেষ বিচারে তাদের বিবেচনায় বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত মানুষদের বরাদ্দ হয়ত বন্দী শিবিরই। মানবিক বিবেচনার কথা যদি বাদও দিই, যদি এই সংখ্যাটা ২০-৩০ লক্ষ হয়, তবে কীভাবে সম্ভব এত মানুষকে বন্দী শিবিরে আটক করে রাখা? তাছাড়া, শুধু এই মানুষগুলিই নয়, এঁদের সন্তান সন্ততিদেরও প্রজন্মের পর প্রজন্ম বইতে হবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর পরিচয়। কারণ নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন করে আগেই জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিধান পাল্টে নেওয়া হয়েছে। বাবা বা মায়ের মধ্যে অন্তত একজন যদি ভারতীয় নাগরিক না হয় এবং অন্য জন যদি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হয়, তবে ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও একটি শিশু ভারতের নাগরিকত্ব পাবে না। তার মানে এই মানুষগুলির পরবর্তী প্রজন্ম ভারতীয় নাগরিকের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলেও তাদের সন্তানদের ভারতের নাগরিকত্ব জুটছে না।

এটা স্পষ্ট যে, এই মানুষদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে না এবং তা কার্যত অসম্ভব। বাংলাদেশ কখনোই অতিরিক্ত ১০-২০ লক্ষ মানুষের বোঝা গ্রহণ করবে না। এ ধরনের কোনো আলোচনা উত্থাপিত হলে বাংলাদেশেও সামাজিক অশান্তির জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। জাতিগত হিংসা ও অবিশ্বাস তখন সীমান্ত পেরিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, কোনো অবস্থাতেই এই বিশাল জনসংখ্যাকে বন্দী শিবিরে আটকে রাখা সম্ভব নয়। এ ধরনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে দেশে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। আবার কোনো অবস্থাতেই এই মানুষগুলিকে নাগরিকত্ব দিতে আসামের স্থানীয় মানুষেরা রাজী হবে না। যদিও বাংলাদেশ থেকে কত মানুষ এসেছে তা নিয়ে যা বলা হচ্ছে তার সবটাই অনুমান। আজ যে পরিস্থিতির জন্ম হয়েছে তার মূলেও রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন অনুমান। এমন একটি অচলাবস্থার মুখে দাঁড়িয়ে অসমীয়া সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও একটি মানবিক সমাধানের কথা বলছেন। বলছেন, জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিধান ফিরিয়ে আনার কথা। বলছেন, সমস্ত সম্ভাব্য আইনী ও মানবিক বিবেচনার পরও যাদের ভারতীয়ত্ব প্রমাণিত হবে না, তাদের সমস্ত নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করে শুধুমাত্র ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হোক। এদেশে জন্ম হওয়া তাদের সন্তানদের পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রদান করা হোক।

এই অচলাবস্থার শেষ কোথায় এখনও কেউ জানেন না। বাঙালিদের অবস্থান থেকে দেখলে এই গোটা বিষয়টাই অন্যায়। কোনো অবস্থাতেই এটা মেনে নেওয়া যায় না। অন্যদিকে, অসমীয়ারা বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্থানীয় মানুষদের ধারণা, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপগুলি না নিলে তাদের জাতিগত অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাদের এই ধারণার সমর্থনে তারা উল্লেখ করেন ত্রিপুরা রাজ্যের কথা। ত্রিপুরায় ১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময়ে মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ ছিলেন 'উপজাতি' সম্প্রদায়ের মানুষ। বাঙালিরা ছিল ৩০ শতাংশ। আজ এই হিসেব সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। এই মুহূর্তে ত্রিপুরার জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বাঙালি, 'উপজাতি'রা ৩০ শতাংশ। স্থানীয় মানুষেরা এও বলেন, বাংলাদেশ থেকে আসার অনুপ্রবেশকারীদের 'স্রোত' বন্ধ না হলে আসাম ফিজি হয়ে যাবে যে ফিজিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যাওয়া অভিবাসী ভারতীয় শ্রমিকদের বর্তমান বংশধররাই প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। স্থানীয়রা কোণঠাসা হয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালের পর আসামের ইতিহাস এই ধারণার স্বপক্ষে কোনো সাক্ষ্য দেয় না। বরং বাঙালি জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ আজ অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে এখানকার সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন। আসামের ভাষা, সংস্কৃতির বিকাশেও এখানকার বাঙালিদের অবদান অপরিসীম। গত

৭০ বছরে আসামে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি অসমীয়া ভাষাকে কোণঠাসা করার মত কোনো পরিস্থিতি কখনোই সৃষ্টি হয় নি। বরং আসামের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিই বারবার সরকারি ভাষানীতির ফলে আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়েছে। সরকারি নীতির ফলে জেলায় জেলায় বাংলা মাধ্যমের বিদ্যমান বিদ্যালয়গুলি ধুঁকছে। আসামের অসমীয়া প্রধান অঞ্চলে নতুন করে বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ঘটনাও শোনা যায় না। কিন্তু স্থানীয় মানুষদের মনে যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত ভয় ও আতঙ্ক, তা অমূলক হলেও তার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। ফলে এই গোষ্ঠীগত আতঙ্ক ও অবিশ্বাসকেও গণতান্ত্রিকভাবে মান্যতা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার এটাও ঠিক, একটি ভাষাগোষ্ঠীর গোষ্ঠীগত অভিমান ও আতঙ্ক নিবারণের জন্যে অন্য একটি ভাষাগোষ্ঠীকে প্রজন্মের পর প্রজন্মের জন্যে বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়ার বিধান কোনো সভ্য সমাজ গ্রহণ করতে পারে না। আসামের নাগরিকত্ব সংকট নিয়ে যদি মানবিক সমাধানের উদ্যোগ সরকার ও সমস্ত ভাষিক গোষ্ঠীর তরফে না নেওয়া হয় তবে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলেই এক নতুন প্যালেস্তাইন বা রোহিঙ্গা প্রদেশের জন্ম হবে।

আপাতত সমস্তটাই অনিশ্চিত। কোনো সমাধান দৃশ্যমান নয় এবং এটাই এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় সত্য।

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার: লেখক, সংগীত শিল্পী,
সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মী, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাথে যুক্ত।
ইমেইল: subha1962@gmail.com

তথ্যসূত্র :

১। অমলেন্দু গুহ, *প্ল্যান্টার্স রাজ টু স্বরাজ, ফ্রিডম স্ট্রাগল এন্ড ইলেক্টোর‍্যাল পলিটিকস ইন আসাম (১৮২৬-১৯৪৭)* - ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টরিক্যাল রিসার্চ, পিপলস পাবলিশিং হাউস, নতুন দিল্লি

২। সুজিৎ চৌধুরী, *বরাক উপত্যকা: সত্য ও তথ্য*- বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর

৩। শামসুল ইসলাম, *মুসলিমস অ্যাগেইনস্ট পার্টিশন*- ফারোস মিডিয়া এন্ড পাবলিশিং হাউস, নতুন দিল্লি।

৪। দেশভাগ-দেশভাগ-প্রসঙ্গ উত্তরপূর্ব ভারত- সম্পাদনা: প্রসূন বর্মন, ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি

৫। অরিজিৎ আদিত্য, *ডি- রাষ্ট্র যখন নিপীড়ক*– প্রাসঙ্গিক প্রকাশনী, শিলচর

৬। Jozdeep Biswas, The starkness of being nowhere- *The Hindu*, September 10, 2015

৭। Udazon Misra, Why many in Assam see the National Register of Citizens as lifeline- *The Wire*, August 24, 2018

৮। Faizan Mustafa, Who is a citizen in Assam, India?- *The Indian Express*, June 6, 2018

৯। Kaushik Deka, The nowhere people : Assam and the citizenship register- *India Today*, July 27, 2018